গল্পসংগ্রহ

গল্পসংগ্রহ ২ গল্পসংগ্রহ ৩ গল্পসংগ্রহ ৪

গল্পসংগ্রহ ৫ গল্পসংগ্রহ ৬ গল্পসংগ্রহ ৭

গল্পসংগ্রহ ৮ গল্পসংগ্রহ ৯ গল্পসংগ্রহ ১০

গল্পসংগ্রহ ১১ গল্পসংগ্রহ ১২ গল্পসংগ্রহ ১৩

গল্পসংগ্রহ ১৪ গল্পসংগ্রহ ১৫ গল্পসংগ্রহ ১৬

গল্পসংগ্রহ ১৭ গল্পসংগ্রহ ১৮ গল্পসংগ্রহ ১৯

গল্পসংগ্রহ ২০ গল্পসংগ্রহ ২১ গল্পসংগ্রহ ২২

গল্পসংগ্রহ ২৩ গল্পসংগ্রহ ২৪ গল্পসংগ্রহ ২৫

গল্পসংগ্রহ
শিমুল মাহমুদ

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭
অথবা
www. boibazar.com
হট লাইন ০৯৬১১২৬২০২০

গল্পসংগ্রহ	শিমুল মাহমুদ
প্রকাশক	নালন্দা
	৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট)
	তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	শিমুল মাহমুদ
প্রচ্ছদ	নির্ঝর নৈঃশব্দ্য
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৭৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ

©	Writer
Galposangraha	
(*Collected Fictions*)	Shimul Mahmud
Cover Design	Nirzhar Noishabdya
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel
	Nalonda
	38/4 Banglabazar (Mannan Market)
	2nd Floor, Dhaka 1100
Price	750.00 Tk only
ISBN	978-984-97773-7-3
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

সুবিমল মিশ্র

বিষয়ক্রম

পাঠপ্রেক্ষিত # ০৯
গল্পভাবনা # ১১

ইলিশখাঁড়ি ও অন্যান্য গল্প
ইলিশখাঁড়ি # ৩১
ব্রেস্ট ক্যানসার # ৩৯
আমার মেয়ের নাম ছিল প্রজ্ঞা # ৪৪
পতাকা-প্রতিকৃতি # ৪৭
চিত্রশিল্পী বিয়াত্রিচের জেন্ডার বিষয়ক স্বাধীনতা # ৫৪
আখের গুড় থেকে তৈরি লাল রেলগাড়ি # ৫৯

মিথ মমি অথবা অনিবার্য মানব
জরৎকুমারী # ৭১
বুদ্ধ বলিলেন আমি একজীবনে বহু জীবনের স্বাদ ভোগ করিতে চাই # ৭৯
কুকুরজীবন অথবা ধানিদেবতার গল্প # ৮৯
বিয়ের আগেই আমরা মিলিত হয়েছিলাম কিনা # ৯৮
প্রাচীন কলস ও যৌনতার গল্প # ১০৯
বিশ্বাসের ভাইরাস # ১১৭
ক্ষমতাবান জিন-ভূতের কাহিনি # ১২৭
শফিক নামের যুবকটি শিখারাণী সাহাকে যেভাবে ভাষাশিক্ষা দিয়েছিল # ১৩৩

হয়তো আমরা সকলেই অপরাধী
শত্রুসম্পত্তি # ১৪১
একজন কবির ব্যক্তিগত স্পেস # ১৬২
নিতাই বৈরাগীর সংগীতকথা # ১৮০
উত্তর-উপনিবেশী মানুষের মুখ # ১৯৮
আমাদের চশমাগুলো নাই হয়ে যায় # ২২২

মনোবিকলন গল্প
দেখার অনুমতি # ২৬৩
আমাদের একাকিত্বগুলো # ২৭২
১৯৪৭, মহিষভাই দুধভাই # ২৮২
জলপাই রঙের ট্রাক # ২৯০
ফেরা অথবা হারিয়ে ফেলা # ২৯৮
রূপকথার কৌটায় লাল রেলগাড়ি # ৩০৮
যৌনতা নিরোধক মেডিসিন # ৩১৭
মুদ্রা বিনিময়ে আপনার অবস্থান # ৩৩৪
কসাইপট্টি থেকে শিশু নিকেতন # ৩৪০
প্রমিথিউস আপনাকে কী বলতে চায় # ৩৫১

পাঠপ্রেক্ষিত

শিমুল মাহমুদের কবিতার মতো তার গল্প নিয়েও বলা সম্ভব, শিমুলের গল্পের বয়ানকৌশল তৈরি হয়েছে তার সহজাত প্রবণতা ও আইডিয়ার যৌথ প্রযোজনায়। যা তার ধ্বনি-কাঠামো, ভাষা-নির্ভরতা ও বোধের শাখাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার ভাষাবোধ গল্পের গভীরতল থেকে উঠে আসে, প্রাথমিক শব্দগত অর্থের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে; সহজাত কারণেই 'চিরায়ত জীবনের ক্ল্যাসিক অথচ প্রাত্যহিক প্রজ্ঞাগত-সংকট' তাকে শব্দ বিস্তারে সাহস জোগায়। ফলে তার লেখায় অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় অমীমাংসা এবং সংশয়।

সুতরাং, 'স্বপ্নের মধ্যে ভেসে উঠল একটা সাদা ধবধবে শুকনো নদী। একটা বিশাল ইলিশ তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।' অথবা, 'Abortion-এর পর ঠিক ছয় ঘণ্টা সাতান্ন মিনিটের মাথায় প্রজ্ঞার রক্তের ভিতর প্রজ্ঞার মা-র মৃত্যু হলো।' এবং আমরা দেখতে পাই, 'হাতের মুঠোয় তখনও ধরা আছে তাজা কবুতরের টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা দেহ।' আর তখন, 'বিয়াত্রিচের দেহের নরম অংশগুলো আগুনে সেঁকে সেঁকে রাতের খাবার সেরে নিচ্ছে ওরা দুই বন্ধু।' পাশাপাশি 'আখের গুড় থেকে তৈরি লাল রেলগাড়ি' গল্প থেকে আমাদের নাকে ভেসে আসতে থাকে মানুষ-মরা গন্ধ, 'লাল রেলগাড়িটা যতদূর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে যেতে থাকল, মাগি-মরা গন্ধটাও ততটা দূর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কদম আর সাবানকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল।'

শিমুলের গল্প বুঝতে হলে নক করতে হবে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার পর্দা ছাপিয়ে ইন্দ্রিয়গত জানালার কপাটে। তখন আপনি ক্রমশ পৌঁছে যেতে থাকবেন ইমোশোনাল ডাইমেনশনের বিভ্রমে। সুবিমল মিশ্র অথবা কমলকুমারের মতো শিমুলের গল্পে খুব কমই স্থান পেয়েছে বরেণ্য নায়ক। অধিকাংশ পরিবেশেই হাজির হয়েছে সাধারণ অথচ অ্যাবনরমাল চরিত্র, নিতান্ত পার্থিব মানুষ অথচ সূক্ষ্ম চেতনার অমোঘ চোখ, যেনবা অপার্থিব। আর আছে মানবিক ঐতিহ্য। যেখানে আছে সরলতা অথচ ঐন্দ্রজালিক অনিবার্যতা; যা গল্পকে প্রথাগত উপস্থাপনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে গল্পকার শিমুল মাহমুদকে পাঠ হয়তোবা কিছুটা দুরূহ। তন্নিষ্ঠ পাঠের অহংকারে নিভৃত।

শিমুল মাহমুদের প্রধান পরিচয় তিনি কবি; একজন পরাধুনিক কবি। প্রসঙ্গত বলা সম্ভব তার গল্পগুলোও তার কবিতারই এক্সটেনশন। ফলে সঙ্গত কারণেই তিনি কবিতা ও গল্পের প্রচল সীমানা ভেঙেছেন; অতিক্রম করেছেন লেখার প্রথাগত ফর্ম; ফলে ভাষা ক্রমশ মুক্ত হয়ে ওঠে তার মিথোপোয়িক চৈতন্যে ও প্রকাশে। কবিতার মতো তার গল্পসমূহ ক্রমশ এমন এক মিথ্যার জগৎ সৃজন করে চলে যা পক্ষান্তরে সত্যের ইশারাকে জাগিয়ে তুলতে প্ররোচিত করে। এগুলো এমনই এক জাদুবিদ্যা, যা মগজের কিয়দংশের ভেতর সৃষ্টি করে হাজার ঝালরবিশিষ্ট জানালা; যে জানালা দিয়ে কোটি বছর ধরে কোটি সৌর বছর অতিক্রম করে আসা মহাজাগতিক রশ্মি প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। আর এভাবেই আপনার মগজ যখন আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠতে থাকে তখন আপনি হয়ে ওঠেন ত্রিকালদ্রষ্টা; স্বয়ং টিরোসিয়াস।

শিমুল মাহমুদের গল্পের বই 'ইলিশখাঁড়ি ও অন্যান্য গল্প' প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৯৯ সালে। এরপর ২০০৩ সালে 'মিথ মমি অথবা অনিবার্য মানব', ২০০৮ সালে 'হয়তো আমরা সকলেই অপরাধী' এবং ২০২১ সালে প্রকাশ পেয়েছে সর্বশেষ গল্পের বই 'মনোবিকলনগল্প'। শিমুল মাহমুদের গল্পসংখ্যা সাকুল্যে ২৯।

শিমুল মাহমুদ পণ্ডিত শ্রেণির অ্যাকাডেমিক ট্র্যাশ থেকে ঘোষণা দিয়েই দূরে রেখেছেন নিজেকে। পাশাপাশি অস্বীকার করেছেন লিঁয়াজোবাদি পুরস্কার, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক পিঠচাপড়ানো, যাবতীয় অনুষ্ঠান, মঞ্চবাজি, মিডিয়াবাজি। এমনকি নিজের রচনাগুলোকে বাছাই করতে গিয়ে খারিজ করেছেন অধিকাংশ লেখা।

তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পাঠগ্রহণ শেষে ইউজিসি-র স্কলার হিসেবে পৌরাণিক বিষয়াদির ওপর গবেষণা করে অর্জন করেছেন ডক্টরেট ডিগ্রি। রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার সঙ্গে সংযুক্ত শিমুল মাহমুদ গত শতকের আশির দশক থেকে শুরু করে চলমান শতকের শূন্য দশক অবধি সম্পাদনা করেছেন সাহিত্যের কাগজ 'কারুজ'।

প্রকাশক
রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল

গল্পভাবনা

অমানবিক বলে আদতে কিছু নেই; সবই জান্তব জীবন মাত্র। এই জান্তব জীবন অজস্র নীতিবোধ আদর্শ আর ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষাও জটিল এবং কুৎসিত। এই জান্তব জীবনের ভেতর আমরা আমাদের ছেড়ে দিয়েছি। এই যে ছেড়ে দেওয়া এটা আসলে জীবনের দিকেই অংশগ্রহণ। জন্ম মাত্রই এই অংশগ্রহণ অনিবার্য। এই অনিবার্য অংশগ্রহণের ভাষিক রূপান্তরই গল্প। হতে পারে একটা রাক্ষসের গল্প। ঐ রাক্ষসটা আসলে আমি অথবা আপনি অথবা জীব জগতের অপর কেউ; যা আমাদের জান্তব অভিজ্ঞতার অংশ।

আমরা আদতে কিছুই কল্পনা করতে পারি না। আমরা আমাদের সমগ্র জীবনের, গোটা একটা মানবজীবনের, হতে পারে তা প্রত্ন-অভিজ্ঞতা-আশ্রিত জীবন; এমনতর একটা জীব-বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপায়নের অভিধাই আমরা কল্পনা করতে পারি; যা আসলে কল্পনা নয়, বাস্তব। এই বাস্তবতার বাইরে অন্য কিছু আমরা ভাবতে পারি না। এ অর্থে কল্পনা অর্থ বাস্তব-জীবন-আশ্রিত তথা বস্তু-আশ্রিত ভাষিক অথবা চিন্তক রূপ মাত্র। কল্পনা বলে আসলে কিছু নেই। যাকে আমরা কল্পনা বলি; আসলে তা বাস্তবতার রূপক উপস্থাপন। বহুস্তর-আশ্রিত অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমরা এমনতর ভাষিক রূপক প্রকাশ করতে বাধ্য।

গল্প বলতে আমি এরকম রূপক-আশ্রিত জান্তব বাস্তবতাকে বুঝি। জান্তব বাস্তবতার ভেতর দেখতে পাই, শঙ্খনদীর তীরে জোছনাদের পোষমানা ঘোড়া সবুজ ঘাসের প্রাণ থেকে খুঁটে খাচ্ছে আমাদের ফেলে আসা সময়। এই খুঁটে খাওয়া সময়ের ভেতর তাকিয়ে দেখি আমার প্রথম লেখা, নারী বিষয়ক একখানা প্রবন্ধ। অবশ্য এর আগে অথবা পরে লিখেছিলাম ছড়া জাতীয় একটা কিছু; যা আমি কোথাও ছাপতে দেইনি। শিরোনাম দিয়েছিলাম 'স্যান্ডেল'। যা ছিল প্রধানত শোষিতের পক্ষে এক ধরনের রূপক-আশ্রিত হাহাকার মেশানো প্রতিবাদের প্রকাশ।

যাই হোক, এ সময় আমি শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি ৮ম শ্রেণিতে থাকালীন পাঠ করি। প্রবন্ধটি আমাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনগুলোতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করি। তখন দৈনিক ইত্তেফাকের সাথে সাপ্তাহিক রোববার নিয়মিত সংগ্রহ করে পাঠ করতাম। সিরাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিতে একবিকেল না গেলে, বিমর্ষ হবার অভিজ্ঞতা পেতে শুরু করেছি। বিভিন্ন দেশের ও আমাদের দেশের নারী সমাজের বর্তমান অবস্থান বিষয়ে সপ্তাহ দুয়েকের প্রচেষ্টায় প্রবন্ধটি লেখা শেষ করি। প্রবন্ধের শিরোনাম কী দিয়েছিলাম এখন আর মনে নেই।

তখনও এরশাদ সাহেবের সময় আসেনি; মেজর জিয়া তখন দেশের নায়ক। আমাদের ছাদখোলা ট্রাকে উঠিয়ে ভুরাঘাটে নিয়ে গিয়ে খাল-খনন কর্মসূচিতে ঠেলে দেয়া হলে আমরা ইউনেস্কোর বিস্কুট টিফিন হিসেবে পেয়ে কোদাল মাটি আর কাদার ভেতর নিজেদের বেশ খানিকটা স্বাধীন হিসেবে আবিষ্কার করলাম। সহসা মনে পড়ে পাঁচ বছর পেছনের কথা, স্বাধীনতার পর তখন আমরা আলমডাঙাতে থাকি; আলমডাঙা একটি থানা। তখন উপজেলা বলে কিছু ছিল না।

সেই তখন, আলমডাঙার বটতলার মোড় পার হয়ে আমাদের সরকারি প্রাইমারি স্কুল। টিনের চালার নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সেই স্কুলটার মাঠ ছিল বিশাল। স্কুলের একটা টানা পুরোনো দালান ঘরও ছিল। সেই স্কুলে, তখন টিফিনে বিলেতি দুধ বিলি শুরু হয়েছে। একদিন আমি কাগজের ঠোঙায়, যে ঠোঙা অংক খাতার পাতা ছিঁড়ে তৈরি করা হয়েছিল; সেই ঠোঙায় বিলেতি দুধ নিয়ে বাসায় ফিরছি। আমরা তখন আলমডাঙা থানা কাউন্সিলের দোতালা সরকারি বাসভবনে থাকতাম।

আমি বন্ধুদের সাথে হাতের ঠোঙায় বিলেতি দুধসহ ফিরছি বাসার দিকে। অথচ সেদিন বাসায় না ফিরে হাঁটতে হাঁটতে মিশে গিয়েছিলাম পাখি শিকারিদের সাথে। আদিবাসী ওরা। ওদেরকে বলা হতো কলু। আসলে শব্দটি ছিল কোল; যে যার মতো করে বলত কলু, কুলু, কোল। মুণ্ডাদের থেকে পৃথক ওদের স্থিতিহীন জীবন। ওদের হাতে থাকত লম্বা চিকন বাঁশ। প্রতিটি আলোকিত সেই বাঁশ লম্বায় পাঁচ ছ' হাত। একটির মাথা আরেকটির ভেতর ঢুকিয়ে তিন চারটি বাঁশ জোড়া দিয়ে, এভাবে সকলের উঁচুতে যে বাঁশটি থাকত তার মাথায় একধরনের আঠা লাগানো থাকত।

খুব সন্তর্পণে জোড়া দেওয়া প্রায় বিশ পঁচিশ হাত বাঁশ ঝাঁকড়া কোনো বট, পাকুড় অথবা দেবদারু, গাব অথবা পুরোনো কোনো ছফেদা গাছ, আর আমি তখন সেই পুরোনো গন্ধে কাঁপতে থাকা সব রকম বৃক্ষরাজির নামও যে ঠিকঠাক জানতাম তেমন নয়; যাই হোক সেই পুরোনো আকাশ-প্রবণ বৃক্ষের ঝাঁক ঝাঁক শাখায় লুকিয়ে থাকা, নিরাপদে থাকা, বিশ্রামে থাকা, আনন্দে থাকা পাখির ঝাঁকের দিকে খুব ধীরে ওরা ঠেলে দিত সেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বাঁশ-শলাকা; সুদৃশ্য জাদুর লাঠি। দীর্ঘ বাঁশের মাথায় আঠার সাথে লেগে যেত সবুজ পাখি, কালো পাখি, লাল পাখি, ধূসর পাখি অথবা মেহগনি রঙের পাখি। আমি অবাক আনন্দে, আশ্চর্য উত্তেজনায় তাকিয়ে থাকতাম সেই আঠায় আটকে যাওয়া পাখির দিকে; কী আশ্চর্য জান্তব জীবন; পাখা ঝাপটে উড়তে চাইছে শূন্যে!

তারপর সেই পাখি কাঁচা বাঁশের খাঁচায় বন্দি হলে আমার উত্তেজনা, আমার আনন্দ বন্দি হয়ে যেত সেই খাঁচাবন্দি পাখির সাথে; আমি ক্রমাগত আটকে যেতে থাকতাম রহস্যের খাঁচায়। আমি ওদের সাথে সেই যারা বাঁশ

চিরে কত রকম গৃহস্থালি তৈজস ধামা, কুলা অথবা মাছ ধরার সরঞ্জাম বানাতে বানাতে লাল কাঁচা রঙে ওগুলোকে রাঙিয়ে দিয়ে ওদের ভাষায় গান আওড়াতে আওড়াতে বিড়িতে আগুন ধরাত; আমি সেই তাদের সাথে আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিচ্ছিল তাজা দুপুরকে এলোমেলো ছড়িয়ে ফেলতাম।

ওরা থাকত খালের ধারে। কখনো বা আমাদের স্কুলের পাশের খোলা জায়গায় অথবা ওদের আমি দেখতাম রাস্তার ধারে খালের পাশে উদোম রোদের শুয়ে মহানির্বিকার। একদিন হাঁটের ভেতর সঙ্গন কাকাকে দেখে চিনে ফেলেছিলাম। সঙ্গন কাকা আমাকে বাতাসা খাইয়েছিল। সঙ্গন কাকার ছেলের নাম ছিল পেঙ্গা। পেঙ্গার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল বেশ আঠালোভাবে। তখনও আমি জানতাম না এই আঠালো বন্ধনের জন্য আমাকে কাঁদতে হবে একদিন।

ডানামেলা রোদের ভেতর, হাজার রঙের রাস্তার ভিড়ে আমরা দু'বন্ধু কাগজের ঠোঙার ভেতরে আমাদের নিরিবিলি স্পর্শকাতর আঙুল ঢুকিয়ে বিলেতি দুধ তুলে নিয়ে আমাদের জিহ্বা ঠোঁট সাদা করে নিতাম; দাঁতের সাথে দুধের মিহিগুঁড়া লেগে থাকত; শুভ্র আঠালো; মিষ্টি তার অনুভব। এই অনুভবের ছোঁয়ায় পেঙ্গা হেসে উঠলে, বটতলার বিল্লু পাগলার সাথে ওর একধরনের মিল খুঁজে পেতাম। ওকে কখনো কাপড় পরতে দেখিনি। নুনুর সাথে বাঁধা ছিল একজোড়া ঝুনঝুনি। সেই শব্দকাতর ঝুনঝুনি ছিল ওর লজ্জাছোঁয়া পোশাক। স্পর্শকাতর ঝুনঝুনি বেজে উঠত কালো চামড়ার স্পর্শে। সেই বেজে ওঠা ধ্বনির সাথে কেঁপে কেঁপে উঠত ওর কালো ত্বক। আমার বন্ধুর নির্বোধ কালো মাজার সাথে লেপটে থাকত মোটা কালো সুতো। সেই অলৌকিক সুতোর সাথে বাঁধা ছিল তিনটি মাদুলি; একটি রুপোরঙা আয়তাকার চ্যাপ্টা; দ্বিতীয়টি কালচে, লোহার পাত কেটে তৈরি গোলাকার মার্বেলের মতো; আর আরেকটি ছিল বন্দুকের গুলির মতো সিসারঙ লম্বাটে গোল। গলায় প্যাঁচানো ছিল কাপড়ের পাড় দিয়ে হাতে কাটা ফিতা। ফিতায় বাঁধা জোড়বাঁধা জাদুর দোলক; একটি পিতলরঙ অপরটি রুপোর পানিতে ধোয়া রুপোরঙ জাদুর তাবিজ।

সেই তখন, আমি ছিলাম উঠতি এক সাহেব-পুত্র। যে সাহেব দেশ স্বাধীন হবার আগেই গ্রাম্য টানাপোড়েন থেকে সাহেব হতে গিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না যে তিনি আসলে বাঙালি নাকি অন্য কিছু। আসলে সাহেব কাকে বলে তখন আমার বাবা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। তবে তাকে মাঝেমধ্যে ইংরেজি আওড়াতে দেখতাম। আরও দেখতাম সাধারণ মানুষের সাথে তিনি মিশে গেলেও তার চারপাশে কেমন একধরনের ভয় জড়িয়ে থাকত। অথচ আমার বাবার কাজ ছিল কৃষকদের সাথে। তিনি ছিলেন বিএডিসি-র কৃষি কর্মকর্তা। তখনকার সময়টাই ছিল খেটে খাওয়া মানুষের বিস্ময়ের সময়। তখন তাদের কাছে একেকজন শিক্ষিত আধা

শিক্ষিত মানুষ মানে একেকজন নায়ক। আর আমজনতা সরকারের লোকগুলোকে ভক্তি করতে পারলে যেনবা বেহশত কিনে ফেলত, এমন একটা ভাব-পরিবেশ।

এমন একটা সময়ের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে কখন কীভাবে জান্তব জীবনের হাত ধরে একটু একটু করে বুঝতে শিখেছি আমাদের ভেতর ভদ্রলোক হিসেবে দাবিকৃত অনেকেই, পাশ্চাত্য ধারায় সভ্য হয়ে উঠতে পারেনি এমন সাধারণ মানুষকে নিচু শ্রেণির মানুষ বলে খারিজ করে দিচ্ছি। অথচ পাঠক, আমি আপনাদের বিশ্বাস করাতে চাইছি পেঙ্গাকে আমি ভালোবাসতাম। অথচ আজকে এই বয়সে এসে আমি নিজেকে প্রশ্ন করছি, আসলে কি তাই? আমি তা বিশ্বাস করি না। আমরা লেখকেরা যখন নিজে যা বিশ্বাস করি না অথচ আপনাকে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করিয়ে তা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করি তখন আমার নিজের চেহারাটা কেমন দেখায় তা ভেবে চমকে উঠি। লেখকজীবনের প্রকৃত যন্ত্রণা এখানেই; আমার ভালোবাসাকে, আমার বিশ্বাসকে আমি মিলিয়ে নিতে পারি না আমার লেখার নিক্তিতে।

এখন আমি বুঝতে পারছি লেখকের অথবা একজন শিল্পীর নান্দনিক আবেগ রাজনীতিকদের কাছে যতটা অর্থহীন তার চেয়েও বেশি অর্থহীন আমার সেই প্রাথমিক জীবনের বন্ধু পেঙ্গাদের কাছে; যারা বেছে নিয়েছিল পাখি শিকারি জীবন; প্রাকৃত নিরাভরণ জীবন। এতটা জীবন পিছে ফেলে এসে আজ তাদের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারছি মানুষ হিসেবে আমি কতটা স্বার্থপর! যারা সুখের পেছনে ছোটে তারা স্বার্থপর। সেই পাখি শিকারির দল, তারা কি প্রতিনিয়ত সুখের পেছনে ছুটেছে? তারা কি স্বার্থপর? কেমন তাদের সুখ? তারা বসবাস করত অনিশ্চয়তার ভেতর খাদ্যহীন উলঙ্গ। অথচ আমি নান্দনিক আকাঙ্ক্ষায় আমার লেখায় নান্দনিক আবেগে বলতে চেষ্টা করি, এই যে অনিশ্চয়তার ভেতর বসবাস, এই যে স্বপ্ন, এই যে পরাজয় এগুলো ভয়ানক কষ্টের হলেও এর ভেতর একধরনের আনন্দ আছে; আছে স্বাধীনতা আর দিগন্তহীন উলঙ্গ জীবন। এইভাবে আমি জীবনকে সহনীয় আর রোমান্টিক চাদরে জড়িয়ে প্রকৃত বাস্তবতা থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসি; তৈরি করে দেই এমন এক মিথ্যার জগৎ যেটা একধরনের নেশার খতিয়ান।

লেখকের কলমে থাকে পরিশীলিত নান্দনিক জগৎ তৈরির জাদুকরী তাবিজ; যা পাঠককে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করতে সক্ষম। রহস্যমুখর তৈরিকৃত দৃশ্যকল্প; যেখানে লেখক নিজেই মুখোশধারি ঈশ্বর; অথচ পক্ষান্তরে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেন সাধু, যেনবা নিরপেক্ষ নিরাপদ বিবেক; তৈরি হয় ফিকশন; যা লেখকের সত্যিকার চেহারা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখে অনুভব-প্রশান্তি অথবা সংকটের ভেতর ঠেলে দেয়। পাঠককে শিল্পের বিভ্রমের ভেতর এই ঠেলে দেবার শক্তি আমি

এখনও রপ্ত করতে পারি নাই; ফলে আমাকে দিয়ে ফিকশন লেখা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে আমি সন্দিহান।

আমি কি বাধ্য? এর বিপরীতে সরাসরি নিজের চেহারাটিকে টেনে বাইরে এনে প্রকাশ করতে; যদিও-বা সেই সাহস আমার কতটুকু আছে, সে বিষয়টিও প্রশ্নসাপেক্ষ। যেমন ধরুন আপনাকে মনে মনে আমি চাবকাচ্ছি অথচ মুখে সৌম্য হাসি টেনে রেখে নিজেকে উপস্থাপন করছি সভ্য হিসেবে; হয়তোবা আপনাকে মা বলে ডাকছি অথচ ভেতরে জেগে উঠতে শুরু করেছে কাম। সমাজশাসিত রুচি নীতি ও শিক্ষা যে অনুভবগুলোকে আমরা সভ্য মানুষের সূচকচিহ্ন হিসেবে মানছি, সেই সমাজতাড়িত বোধ থেকে আমি যখন লিখছি তখন আমি নিজেকে গোপন করছি কৌশলে; আমার ভেতরের কামভাব আড়াল করে কাহিনিতে মায়ের সামাজিক আচরণ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছি।

সুতরাং আড়াল; কেননা আমরা সভ্য হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় নেমেছি; পক্ষান্তরে ক্রমাগত মিথ্যার মুখোশে বিভ্রম ফুটিয়ে তুলছি লেখায়। লেখার জগৎ, বিভ্রমের জগৎ, যেনবা স্বপ্নে কাঙ্ক্ষিত রমণীর সাথে রতিক্রিয়ার জগৎ। আমি দেখতে চাই, শিল্পের বিভ্রমকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি নিজের চেহারাটাকে তুলে ধরা সম্ভব কিনা। আমার ধারণা এটি সম্ভব নয়। কেননা এগুলোর চালিকাশক্তি শিল্পের নান্দনিক বিভ্রম। আমি বিভ্রম থেকে বাইরে এসে বলতে চাইছি, যা আমি এখনও ঠিক লিখে উঠতে পারিনি; যেখানে থাকবে এমন একটা কাঠামো যার ভেতর অভিজ্ঞতার অনুভব গেঁথে গেঁথে এমন একটা কিছু লিখে ফেলা যেখানে মানবজীবনের ধারাবাহিকতা থাকা সম্ভব নয়; বরং থাকবে জীবনকে উন্মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ; অথচ এটি মোটেও নিবন্ধ অথবা প্রবন্ধের নিরস আঙিকের ভেতর আটকে থাকবে না।

আসলে অভিজ্ঞতা তো ধারাবাহিক কোনো অর্জন নয়। আর জীবন তো আমার একার নয়, আপনার তার সকলের; আদিম বর্বর আর এই সময়ের; পূর্বপশ্চিম উত্তর অথবা দক্ষিণের। ফলে ধারাবাহিকতা, সেটাও একধরনের বিভ্রম; যা থাকে গল্পে অথবা উপন্যাসে। অথচ জান্তব জীবনে তা সম্ভব নয়। আর পক্ষান্তরে আমরা তো সবাই নিজেকেই লিখছি। আমি অর্থ প্রত্ন-অভিজ্ঞতা, জলজ-অভিজ্ঞতা, আদিম ও বর্বর জীবন থেকে ক্রমাগত সভ্য হয়ে ওঠার যাবতীয় সংকট। এই সংকটের প্রশ্নে নিজের ভেতরে কে কতখানি অপরকে বুঝে উঠতে পারছি, প্রশ্নটা সেখানে।

পক্ষান্তরে আমি নিজেকে লিখতে গিয়ে শিল্পের অনিবার্যতায় 'আমি'কে বিনির্মাণ করে মিথ্যা 'আমি'কে জাগিয়ে রেখেছি। কারণ আমি চাই না ফিকশনের ভিতর নানামুখি ঐক্যনির্ভর বিভ্রমের আশ্রয়ে আপাত-বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতার ছবি আঁকতে। ঐক্যনির্ভর বয়ানকৌশল, যার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় মানানসই কাহিনি-কাঠামো; যার থাকবে শুরু, বিকাশ

এবং পরিণতি। অথচ জীবনের শুরু আর শেষ বলে কিছু নেই; জীবন অর্থ অনিবার্য ঘটমান বাস্তবতায় ভেসে থাকা; সেটা স্ব-ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায়। এই দৃশ্যমান জগতের বাইরে যে অসংখ্য সৌরজগৎ, যা আপাতভাবে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নিতে পারি না; সেই অদৃশ্য অভিজ্ঞতার জগৎও কিন্তু জীবন; যার শুরু আর শেষ বলে ধারণা লালন করাও একধরনের বিভ্রম।

আমি লেখার ক্ষেত্রে যাবতীয় বিভ্রম থেকে সতর্ক থাকতে ইচ্ছুক, যাতে লেখার ভেতর সত্যিকার 'আমি' বিনির্মিত হয়ে বিভ্রম 'আমি'তে রূপান্তরিত হয়ে ওঠার সুযোগ না পায়। শিল্পের বিভ্রম তৈরিতে আমি ঠিক সিদ্ধহস্তও নই; ফলে রবিবাবু অথবা ইলিয়াসের মতো লেখার যোগ্যতা রাখি না। অবশ্য আমি কারো মতো লিখতেও ইচ্ছুক নই। বরং লেখক হিসেবে আমি বিভ্রম সৃষ্টিকারী মুখোশ, সাধু ঈশ্বরের মুখোশ ঠেলে সরিয়ে সত্যিকার 'আমি'কে লিখতে ইচ্ছুক। যদিও মানুষ প্রাণিজগতের আর সবার মতো নোংরা জীব; এই নোংরা জীবকে সভ্যতার মোড়কে জড়িয়ে যাতে বিভ্রম সৃষ্টি না হয় সেই প্রচেষ্টায় আমাকে মুক্তগদ্যের আশ্রয় নিতে হয়; যদিও আমরা মানবীয় সূচকে প্রতিনিয়ত লড়াই করছি ঈশ্বর হবার বাসনায়। আমরা বাসনাজীবী জীব। এই বাসনার তাড়নায় আমরা নির্মাণ করি শিল্পের বিভ্রম।

আমার অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি শুধু আইডিয়ার তথ্যচিত্র, ঘটনার ডিটেইলস অথবা উপস্থাপনার ঐক্যরীতিই ছোটগল্পের অপরিহার্য কৃৎকৌশল নয়। এগুলি পৃথক প্রকৌশলে সবসময় গল্পে প্রযোজ্য হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ কথাসাহিত্যের জন্য শুধু একটি কৌশলই ক্রিয়াশীল নয় বরং একখানা সফল গল্পের জন্য আইডিয়ার তথ্যচিত্র, ঘটনার ডিটেইলস ও উপস্থাপনার ঐক্যরীতি, এই তিনটি বিষয়ের যৌক্তিক ব্যবহার গল্পে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে ঠিকই কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় এই প্রচল আঙিকরীতিগুলো শেষ পর্যন্ত একটি গল্পকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে?

বাঁচিয়ে রাখার জন্য হয়তো দরকার হয়ে দেখা দেয় প্রকাশযোগ্য ক্রাইসেসের লাগসই উপস্থাপনরীতি। সুতরাং এই লাগসই উপস্থাপনকৌশল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গল্পের প্রচল-আঙিক প্রতিনিয়তই ভেঙে যেতে বাধ্য। এক্ষেত্রে পয়েন্ট অব ভিউ থাকতে পারে আড়ালে; তারপরও এই জায়গাটা লেখকের কাছে পরিষ্কার থাকা জরুরি। অনেকেই এ জায়গাটি নিজের ভেতরে পরিষ্কার বা চিহ্নিত না করেই লিখতে শুরু করেন এবং ভাবেন, লেখাই তাকে টেনে নিয়ে যাবে কোনো একটা ক্রাইসেসের দিকে। হ্যাঁ এভাবে লেখা যেতে পারে, এভাবে লিখতে লিখতে লেখক একসময় গল্পের পয়েন্ট অব ভিউ চিহ্নিত করে ফেলেন। এভাবে পয়েন্ট অব ভিউ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে পারে ডিটেইলসে;